রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

Ah, did you once see Shelley plain,
And did he stop and speak to you
And did you speak to him again?
How strange it seems, and new!
-memorabilia: Robert Browning

পন্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গে যথাক্রমে রাগ - অনুরাগ ও কোমলগান্ধার বইয়ে কাজ শু করার আগে অ ামার পরিস্থিতিটা প্রায় একই ছিল। ১৯৭৭-এ রাগ - অনুরাগ বইয়ের কথা যখন হচ্ছে, তখন রবিশঙ্করের মনে বেজায় অভিমান জমে আছে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর ব্যাপারে। এই গোষ্ঠীরই ইংরেজি সাপ্তাহিক সানডেতে তার কিছুদিন অ াগে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল 'হু ইজ আওয়র টপ সিতারিস্ট?' শিরোনামে। তাতে নিবন্ধকার রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর তৎকালের বাজনার তুলনা করে আড়েঠারে প্রায় বুঝিয়েই দিয়েছিলেন যে, তাঁর ভোটটা পড়বে দ্বিতীয়জনের পক্ষে। এছাড়া সেই সময়ে এই পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রকাশনায় তাঁর অনুষ্ঠানাদির আলোচনায়ও তিনি বেশ ক্ষুন্ন ছিলেন। তাই মাঝে ম াঝেই আমার সঙ্গে বই করার কথা উঠলেও তিনি দেখি - দেখছি করছিলেন। শেষে আনন্দ পাবলিশার্সের প্রতিনিধি বাদল বসুকে নিয়ে কাজের দিনক্ষণ নিয়ে কথা বলতে গেলাম, তিনি বলেই ফেললেন, তোমরা তো আমাকে নিয়ে বেশ একটা hot and cold খেলা চালিয়ে যাচ্ছ। এই রিভিউ লিখে পেড়ে ফেলছ, তারপরেই বলছ বই করব। তা তোমরা চাওটা কী?
শেষে রাজি হলেন এবং জানতে চাইলেন, কাল তো আমি মাদ্রাজ যাচ্ছি, সেখান থেকে তিনদিন পর দিল্লি। তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে? আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে দিয়েছিলাম, পারব। কে টাকা দেবে, কে ছুটি স্যাংশন করবে, কদ্দিনের ট্রিপ হবে কিছুই মাথায় আসেনি। তারপর যখন সব ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট সময়ে দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছি, উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে কৌতুক মেশানো গলায় কিছুটা প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, সেই এলে শেষ অব্দি, খোকা? আর আমার জানতে বাকি রইল না যে, কয়েক বছর ধরে নেমে - আসা অভিমানের পর্দাটা সামান্য হলেও সরেছে। খানিক বাদে প্লেনের প্রথম সারি থেকে হেঁটে আমার পাশের সিটে বসে পড়ে বললেন, এই নাও টাইম ম্যাগ াজিন, পড়ো। And now tell me about yourself.
বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গে যখন কোমলগান্ধারের কাজে বসছি তখন অফুরন্ত ক্ষোভ শিল্পীর কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্ধে। তার কদিন আগে মস্ত ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে গণ্য করেছেন বিলায়েৎ খাঁ। তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন এবং সে - বৈঠক থেকে ফেরার পথে আমার দুজন বন্ধুকে বলেছেন, এই শেষ। এসব নিয়ে আমি আর মুখ খুলব না। নিজের কথা যা বলার এবার বইতেই বলব। শঙ্করবাবুকে খবর করো, ও আমাকে নিয়ে বই করতে চেয়েছিল। ভাবছি এবার করব।
এই ডেকে পাঠানোরও এক ছোট্ট ইতিহাস আছে। তার বছর পনেরো আগে কলকাতার কলামন্দিরে এক দুর্ধর্ষ বাজনা বা জিয়েছিলেন বিলায়েৎ খাঁ। যার পরদিন পার্ক হোটেলে ওঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই আনন্দবাজারের জন্য। সাক্ষাৎক ারশেষে স্টাইলের মাথায় বললেন, এই টুকরো - টাকরা interview -এ আর কতটা কী বলতে পারি? আরো বড় করে

কিছু ভাবুন।
জিজ্ঞেস করলাম, মানে বই?
উনি কিছু বললেন না, নীরবে হাসলেন।
খাঁ সাহেব তো চলে গেলেন দেহরা দুনের ঠিকানা দিয়ে । বলে গেলেন, এই interview আর আপনার proposal পা ঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়।
আমি লেখাপত্তর সব পাঠালাম, বইয়ের একটা বড়সড় পরিকল্পনাও। কিন্তু দিন গেল, মাস গেল, বছরও ঘুরল, কিন্তু উস্ত াদের কোনো জবাব এলো না। শেষে অন্য কী এক কাজে দিল্লি গিয়ে ঠুমরি- দাদরার মহান শিল্পী নয়নাদেবীর বাড়িতে নেমন্তন্নয় গিয়ে ভদ্রমহিলার মুখে শুনলাম যে, ইচ্ছে থাকলেও আমার সঙ্গে বই করায় অসুবিধে আছে বিলায়েৎ খাঁর। ক ারণ? আমি যে রবিশঙ্করের লোক! আমি না তাঁর রাগ - অনুরাগে কাজ করেছি!
সেই বিলায়েৎ খাঁ দশ বছর পর আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁর স্মৃতিচারণা শোনাবেন বলে! আমি খবর পেয়েই ফোন করলাম। উনি কীরকম বিষন্ন কিন্তু মিষ্টি গলায় বললেন, তুমি আমার বায়োগ্রাফি করতে চেয়েছিলে অনেকদিন আগে। বললাম, এখনো চাই। উনি হাসলেন, বললেন, তাহলে চলে এসো কাল। বুকের মধ্যে অনেক কথা জমেছে। তোমাকে শোন াই।
মাদ্রাজে টেপ চালিয়ে কথা শু করতেই দেখেছিলাম রবিশঙ্করের সব অভিমান কোথায় উবে গেছে, he was just his usual self. ভাসা - ভাসা চোখে হয় উপরে সিলিংয়ের দিকে, নয়তো নিচে কার্পেটের দিকে চেয়ে, চিন্তা করে করে সেত ারের ঘরানা আর ইতিহাস নিয়ে বলে যাচ্ছেন। রাইচকে ওঁর treetop বাংলোর বারান্দায় বসে অদূরের গাছগাছালি অ ার আরেকটু দূরের নদীর দিকে চেয়ে বিলায়েৎ খাঁ যখন কথা শু করলেন ওঁর মুখ তখনো ক্ষোভে, অভিমানে অন্ধকার। শু হলো ওঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা দিয়ে ঠিকই, কিন্তু দেখতে - না - দেখতে প্রসঙ্গ বদলেগিয়ে চলে গেল রবিশঙ্কর আর ভারতরত্নে। ততক্ষণ কথার মধ্যে যে একটা রোম্যান্টিক ঝিম ভাব ছিল ওঁর, সেটা সহসা কেটে গিয়ে ভীষণ চাঞ্চল্য আর রাগ ধরা দিতে শু করল কথায়। বললেন, আর তারপরও বলছি, আমার বেশি দুঃখটা তো গভর্নমেন্টের দিকে নেই, বেশি দুঃখটা ওদের দিকেই, যারা মুখ বুজে অ্যাওয়ার্ডগুলো নিয়ে নিয়েছে। তুমি বলছ রবিশঙ্করজি নাকি ভারতরত্ন নেওয়া পর বলেওছেন যে, এই সম্মান বিলায়েৎ খাঁরও পাওয়া উচিত ছিল। তাহলে উনি খেতাবটা নিয়ে নিলেন কেন? অ ামার তো বেশি দুঃখ গভর্নমেন্টের থেকে রবিশঙ্করজির ব্যাপারে, আজ তো আমার বলার turn তাই মুখ খুলে, বুক খুলে বলে নিচ্ছি। আমার পাওয়া উচিত যদি উনি মনে করেই থাকেন তাহলে ভারতরত্ন নিয়ে নিলেন কেন? ভেতরে ভেতরে উনি তো ঠিকই জানেন যে, মিউজিশিয়ান হিসেবে আমি আরো senior artiste on stage, আর আমি একটু বেশি ভ ালো বাজাই ওনার থেকে ... সেটা উনিও জানেন।
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওঁর একটু আগের রোম্যান্টিক, লিরিকাল কথার মেজাজ ভেদ করে রাগ আর অভিমানের স্বরগুলো ফুটে উঠছে। আমার মনে পড়ল পনেরো বছর আগের সেই সাক্ষাৎকারে বলা ওঁর কথাগুলো। জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁর চোখে বিংশ শতাব্দীর সেরা পাঁচ যন্ত্রী কারা। তাতে বলেছিলেন, পাঁচজন হবে না। চারজনের কথাই বলব --- বিসমিল্লা খাঁ, আলি আকবর খাঁ, রবিশঙ্করজি আর আমি। ওঁর মুখে তখন রবিশঙ্করের নাম শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম অত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কি মুখে আনবেন? উনি কিন্তু বলেই গেলেন, সেতারের ব্যাপারে রবিশঙ্করজির নাম না করে উপায় আছে? এই সেতার যন্ত্রটার জন্যে উনি একাই যা করেছেন, তার কি তুলনা আছে?
আজ আজ? পরক্ষনে মনে পড়ল যে, এটাই বিলায়েৎ খাঁর। দুই মের মিলন ওঁর মধ্যে সারাক্ষণ, আলো - আধারের মেল ামেশা, হাসি - কান্নার তীব্র ওঠাপড়া। আমার মনে পড়ল রবিশঙ্করের কথাগুলোও রাগ - অনুরাগ রচনার সময়কার স াক্ষাৎকারে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, হঠাৎ যদি শোনেন যে, বিলায়েৎ খাঁর হাত পড়ে গেছে, কী মনে হবে আপনার? বললেন, যদি শুনি বিলায়েতের হাত আর নেই, তাহলে তো নিজের বাজনা চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হবে। চল্লিশ বছর ধরে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে আজ আমরা এখানে পৌঁছেছি। কাজেই হঠাৎ করে ও থেমে গেলে তো মনে হবেই -- ত াহলে আর কার জন্য বাজাব!
কথাগুলো যে আঁতের কথা, নিছক দাঁতের কথা নয়, তা আমি ততদিনে ুঝতে শু করেছি। ববিশঙ্কর বানিয়ে বানিয়ে, মন

দিয়ে, তারিফ করে বাজনাটা শুনলেন আর কয়েকটা জায়গায় মন্তব্য করলেন, আমাদের বাজনায় আমরা এটা কখনোই করব না। মানে এই পর্দাটা... ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন শিল্পী। তবেই ওই পর্যন্তই! তারপর বিলায়েতের টোনের প্রশংসায় ফিরেগেলেন।

ওঁদের বাজনার মতোই রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ দুই স্পষ্ট, স্বতন্ত্র ধারার মানুষ। রবিশঙ্করের চিন্তাভাবনা ও কথায় সুন্দর স্বচ্ছতা, ভারসাম্য ও অফুরন্ত রস। বিলায়েত খাঁর পুরো ব্যাপারটাই কবিসুলভ মানে আউল - বাউল কবিদের মতো, খুব রঙিন ভাষা ওঁর, হিন্দি উর্দু ইংরেজি মেশানো বাংলা আর ভাষার সহজ টানে কথা যে কোত্থেকে কোথায় যায়, তা উস্তাদের খেয়াল রাখার চেষ্টাও নেই। রাগ - অনুরাগ ও কোমলগান্ধার টেপ থেকে উদ্ধার করতে করতে আমি দুজনের দু-ধরনের বাজনাও যেন শুনতে পেয়েছি। রবিশঙ্করের কথা ধ্রুপদ থেকে লোকসুরের মধ্যে নিত্য যাতায়াত আছে, বিলায়েৎ খাঁর কথায় রং আর তুলির খেলা যেন, কিছু বলাটা তো গুত্বপূর্ণ নয়, একটা ছবি এঁকে দাঁড় করাতে হবে। এই ছবিগুলো যে সবসময়ে বাস্তবের ছবি, তা হয়তো নয়। রবিশঙ্করের কথাতেও ছবি তৈরি হয়, তবে সে - ছবি ছোট্ট ছোট্ট ডিটেলে আঁকা স্মৃতির ছবি। তবে দুজনের কথার মধ্যেই মস্ত এক মিল এক জায়গায়। দুজনের কথা থেকেই একটা নিঃসঙ্গ মানুষ বেরিয়ে আসে একসময়। দীর্ঘসময় ধরে কথা শুনে শুনে এও টের পেয়েছি যে, দুজনাই ভেতরে ভেতরেবড্ড দুঃখী মানুষ। বিলায়েৎ খাঁ বারবার সে - কথা বলে দেন, রবিশঙ্কর সেটা কণভাবে চাপা দেওয়ায় ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ। এত স্বচ্ছ, স্পষ্টবক্তা মানুষটির ওই এক আলো - আঁধারি এলাকা। আর বিলায়েৎ খাঁ, যিনি রহস্যে ভরা, রঙিন কথার জাল বোনেন, ওই নিঃসঙ্গতা ও দুঃখের প্রসঙ্গে দেদার সাপাটতান টেনে নেন। একটা পর্যায়েই কিন্তু খুব গর্বের জায়গা ওই দুঃখের জীবনটা। যেটা বাজনায় ধরা দেয়।

।। দুই ।।

রাগ - অনুরাগের পরেও রবিশঙ্করের সঙ্গে ওঁর বাল্যস্মৃতি নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম আনন্দবাজারের পূজাবার্ষিকীর জন্য। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী যার শিরোনাম করেছিলেন 'বেণীমাধবের ধবজা থেকে আইফেল টাওয়ার'। পরে স্মৃতি নামের একটি বই হয় এই রচনা নিয়ে। তাতে শিল্পীর যে মুখের ভাষা ও স্মৃতির চেহারা ধরা পড়েছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। আমার পড়া ও জানা পাঁচটি সেরা শৈশবস্মৃতির মধ্যে তা অনায়াসে এসে যাবে। ১৯৮৫ কী ৮৬-র এক দ্বিপ্রহরে কেনিলওয়র্থ হোটেলে এক সুইটে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। এক ফরাসি চলচ্চিত্র দল কলকাতায় এসেছিল শিল্পীকে নিয়ে একটা ছবি তোলার জন্যে। ওদের হাজারো প্ল্ন ও শটের ফাঁকে ওই তিনটে নির্জন ঘন্টা কী করে বেরিয়ে এলো আমি নিজেও জানি না। পরে বুঝেছি কারণ ছিল তিনটে এক, মা। দুই, বাবা। আরতিন, কাশী। এই ত্র্যহস্পর্শে সমানে এক উথালপাথাল চলছিল রবিশঙ্করের মধ্যে। সে - রচনার কয়েকটা নমুনা দিলে পাঠক আঁচ পাবেন কী ওঠাপড়া চলছিল আমার মনের মধ্যে যখন সামনে বসে শুনছি মহান শিল্পীর সেই চোখের জলে ভাসা স্মৃতিচারণা।

প্রথমে কাশীর কথাটা তুলে দিই। ---

'প্রায় সাতষট্টি বছর আগেকার কথা দিয়ে শু করতে পারি। আমার জ্ঞান হওয়া থেকে প্যারিস যাওয়া পর্যন্ত আমি কাশীতেইছিলাম। জন্মও আমার কাশীতেই। আমার বাবা কাজ করতেন ঝাড়োয়ার স্টেটে, রাজস্থানে। তারপর উনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান বিলেতে। আমি তখন মাতৃগর্ভে। মা আমার তিন ভাইকে, এবং অবশ্যই আমাকে, নিয়ে কাশীতে চলে আসেন। আমার জন্ম হয় সাতই এপ্রিল। তিলভাণ্ডেশ্বরের ঠিক মুখে, একটা ছোট্টবাড়িতে। শুনেছি, আমার জন্ম নাকি ভোরবেলায়। তারপর যা আমার খণ্ড খণ্ড মনে আছে -- আলাদা আলাদা বাড়ি। বিশ্বাস জমিদার ছিলেন আমার বাবার খুব বন্ধু। বাবা তাঁকে আমাদের গার্জেন করে গিয়েছিলেন, ফ্যামিলি দেখাশোনা করবার জন্যে। প্রথমে তাঁর বাড়ি। উঠোনে রাত্তির বেলায় আগুনের গোলা এখানে - ওখানে ছুটোছুটি করতে দেখা যেত। আমি শুনতাম, দেখতে যেতে চাইতাম, কিন্তু বড়রা দেখতে দিত না, বলত -- শুয়ে পড়। ও বাড়ির আরেকটা বিশেষত্ব ছিল ---এখানে একটা আত্মা ছিল, সে বিভিন্ন রূপ ধরে আসত। মা হয়তো কোনোদিন অনেক রাত্রে গেছেন কলঘরের দিকে, দেখলেন আমার এক মামা কলঘরে আছেন। ঘরে এসে দেখলেন, মামা শুয়ে আছেন। এইরকম হতো। ... এরপর এলাম তিন নম্বর বাড়িতে। তিন নম্বর বাড়িটার বারান্দা ছিল গলির মুখে -- রাস্তার ধারে। এই বারান্দা থেকে যত মিছিল যেতে দেখতাম। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের পুতরা সব

'হর হর মহাদেও' করতে করতে যেত। কখনও ঝিনাথের মন্দির থেকে আসত মিছিল। নানারকম। আমার পক্ষে তখন ওটা ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

আর তৃষিত নয়নে দেখতাম আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাড়ির বিরাট গেট, তখনকার চোখে আমার কাছে সেটা ছিল একটা প্রাসাদ। সেই বাড়িটা ছিল শ্রীমা দে'র। খুব বড় জমিদার ছিলেন। এবং উনি বেনারসের মহারাজার খুব কেউকেটা একজন ছিলেন। বাড়িতে প্যাকার্ড গাড়ি ছিল, দু-তিনটে মোটর ছিল, জুড়িগাড়ি ছিল। আর আমি ফ্যালফ্যাল করে তা কিয়ে দেখতাম ওদের ওই বড়মানুষী ব্যাপার। আর আমাদের তখন খুব দুরবস্থা। দুরবস্থা কারণ, ঝাড়োয়ার স্টেট থেকে ব াবা একটা পেনশনের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, দু'শ' টাকা করে মাসে আসবে। এবং সে যুগে দু'শ টাকা was an astronomical figure কিন্তু যা হয়, রাজা - রাজড়ার ব্যাপার, টাকা মারতে মারতে, শেষে ষাট টাকা আসত খালি। ষ াট টাকায় মা খুব কষ্ট করেই সংসার চালাতেন। বাবাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু বাবাও খুব উদাসীন ছিলেন। আমরা অনেক অ্যাপিল করেছিলাম ঝাড়োয়ার স্টেটে, কিন্তু কিছু হয়নি।'

কাশীতে এই অভাবের সংসারেই মাকে খুব কাছ থেকে দেখা হয়েছে রবিশঙ্করের। বলেছেন

'যখন টাকার ঘাটতি পড়ত -- জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি -- মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাথায় সিল্কের চাদর - ট াদরঢেকে ঐ দুঃখী তেলীর কাছে যেতেন। দুঃখী তেলী খুব বয়স্ক ছিলেন এবং আমার মাকে মা বলতেন। মা অবশ্য বলতেন, তুমি আমায় মাবলছ -- কিন্তু তুমি আমার ভায়ের মতন। তা যা বলছিলাম, মা প্রত্যেকবার হয় একটা শাড়ি, নয় নাকের ফুল এইসব দুঃখী তেলীর কাছে বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এই করে উনি আমাদের মানুষ করেছেন --- কাউকে জ ানতে দেননি। কী অদ্ভুত! আমি ভাবি --- কীstrength of character ছিল। আমার দাদারাও জানতে পারত না। কেবল আমিই কিছুটা বুঝতাম। আমিই দেখতাম।'

স্মৃতি রচনাটির সবটাই প্রায় মায়ে ছেয়ে আছে। তার শেষও বম্বেতে মা-র সঙ্গে শেষ দেখায়। বলেছেন

'বোটে যখন উঠছে সবাই --- মা, আমি আর বাবা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবা তো মাকে মা - মা করতেন। রত্নগর্ভা,আপনের গর্ভে শিভশঙ্কর আইসে। (কথা আর কী)। মা'র হঠাৎ কী যে হল --- Premonition, perhaps she knew -- আমার হাতটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, উনিও বাবাই বলতেন, -- বাবা, আপনাকে একটা কথা বলব? --- 'বলেন, মা বলেন,' বাবা তো একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন -- আদেশ করেন -- 'না, আপনি তো জানেন -- এর বাবা মার া গেছেন -- বড় দুরন্ত ছেলে, এখন তো কেউ নেই। আপনি একটু দেখবেন একে। ভুলটুল মাপ করে দেবেন,' কারণ মাও তো বাবার মূর্তি দেখেছিলেন, উনি চাইতেনও যেআমি বাবার কাছে শিখি, আমিও চাইতাম। কিন্তু সাহস হত না। বম্বেতে কোনদিন বলিনি। -- মা বলার সঙ্গে সঙ্গে, বাপরে! বাবাও hig-ghly emotional । একেবারে হাউ হাউ করে কাঁদতে ল াগলেন -- মা আপনে বলসেন কী? আপনে রত্নগর্ভা -- আজ থিক্যে আলি আকবর আমার ছোট ছেলে, রবু আমার বড় ছেলে। আপনায় কথা দেলাম। মা আর বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেন জানি না, ভেউ ভেউ করে কাঁদছি --- বড় বিশ্রী পরিস্থিতি। কান্নার মধ্যেই মাকে আমি শেষ দেখছি। হাত নাড়ছি। মা দাঁড়িয়ে আছেন চশমা পরে। পরনে ঢাকাই, সেই শেষ দেখা।

কয়েক মাস পরেই প্যারিসে খবর পেলাম --- মা মারা গেছেন।'

মায়ের সঙ্গে রবিশঙ্করের শেষ দেখার মতো বিলায়েৎ খাঁর কোমলগান্ধারেও আছে বাবা উস্তাদ এনায়েৎ খাঁর জীবনের শেষ কয়েক ঘন্টার বর্ণনা। মনে আছে রবিশঙ্করের সেই সজল চোখের মতো বিলায়েৎ খাঁর উদাস, উন্মনা চোখ এই কথ াগুলো বলার সময়। দুজনের কেউই চোখের জল দেখতে দিতে চান না, সেদিক দিয়ে দুজনই ভালোই macho type, কিন্তু এই বলার কথাগুলোর মধ্যেই একটা দরবারি কানাড়ার কোমালগান্ধারের ছোঁয়া আছে, কিংবা রবিশঙ্করের ক্ষেত্রে তাঁর সানাইয়ে পটদীপের তারার সুরের মোচড়, যেমনটি কিনা প্রয়োগ করেছিলেন পথের পাঁচালী ছবিতে দুর্গার মৃত্যুসংব াদ দিতে গিয়ে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যের আবহে। বাবার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে ক্রমশ জড়িয়ে আসছিল বিলায়েৎ খাঁর গলা। যদিও বলার মধ্যে তেমনভাবালু শব্দ কিছু ব্যবহার করছিলেন না। বললেন---

'আজও চোখের সামনে ভাসে সেই দিনটা যেদিন বাবা চলে গেলেন। ইলাহাবাদ গিয়েছিলেন প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনে। অ ামি ওঁর সঙ্গে ছিলাম, ড্রিঙ্ক - টিঙ্ক তো খুবই করতেন। বিধানবাবু... ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ড্রিঙ্ক একদম বারণ করে

দিয়েছিলেন, he was a regular physician of my father. উনি খুব জোর দিয়েই বারণ করেছিলেন। আজকে বিধানবাবুর কথা খুব মনে আসে কারণ উনি আমার মাকে বলে গিয়েছিলেন -- ও এখন ড্রিঙ্ক করে কি না করে, চার মাসের বেশি ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। ...আমি জানি একথা, যেটা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতো হয়ে গিয়েছিল। আমার জন্মদিনের দু - চারদিন আগে এইসব কথা হচ্ছিল। আগস্ট মাসের কথা। উনি বলছিলেন আমার মাকে ওঁর ওই অদ্ভুত বাংলা - টোনের হিন্দিতে --- মা-জি তোমাকে ভয় করনোকো জরত নেহি হ্যায়। হামকো মালুম হোতা হ্যায়... হাম সব লোক হ্যায়, তুমহারা ভাইলোক হ্যায় ইধার... তিন-চার মাস তুম ভয় নেহি করো, হাম তুমকো বোলতা হ্যায়। ... ডক্টর রায় বলেই দিয়েছিলেন।

তো ওই ইলাহাবাদের কনফারেন্সে ড্রিঙ্ক - টিঙ্ক হয়েছিল, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ছিলেন, সব টেন্টে বসে। আগে তো টেন্টেই গানবাজনা হত। ওঠা - বসা হত। তো সেদিন দুপুরবেলা বমি করলেন। গলা দিয়ে টুকরো টুকরো করে সব বেল রক্তের সঙ্গে। সেই তিন - চার ঘন্টা পর যে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন উনি আর ওঁর প্রোগ্রামও করতে পারলেন না। ওনার সেই প্রোগ্রাম তখন আমি বাজলাম। ভোর চারটের সময় ভৈরবী। ভাল লাগল লোকেদের খুব সে বাজনা। তারপর ট্রেন ধরে বাবাকে ওই অবস্থায় আনলাম এখানে। এসেপৌঁছলাম আমরা বুধবার না গুবার রাত্তির আটটা - ন'টার সময়। ওই রকমই অবস্থা তখনও ওঁর। এখনও মনে পড়ে বাড়িতে কোন জায়গায় এনে রাখা হল, কী জামাকাপড় ছিল শরীরে। আর ও-রকম ভাবেই উনি রইলেন প্রায় চবিবশ ঘন্টা। তারপর রাত একটা না দুটোর সময় এক্কেবারে ঠিক হয়ে গেলেন। তখন আমি ঘুমোচ্ছি, আর মা জেগে। তখন ওঁর নাকি চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মাকে বললেন, তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি জীবনে। তবু আমাকে মনে রেখো। আর মিঞা খাঁকে খুব সামলে রেখো, ওর ওপর আমার অনেক আশা। ...কথাগুলো বলেই মাথাটা হেলে পড়ল বাবার, আর তখন কান্নাকাটির আওয়াজ উঠল, আমারও ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখলাম। বাবা নেই।

বাবার কথা ভাবলে কী রাগ মনে আসে? কী বলব শঙ্করবাবু তোমাকে, বাবার কথা ভাবলে সব রাগের কথাই ভেসে ওঠে মনে And not only that, বাবার স্মৃতিতে জড়িয়ে একেক সময় ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মনে আসেন, মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব মনে আসেন। আর মাকে ভাবলে তো অ- নে - ক কথা, অনেক সুর মনে আছে।'

বাবার কথায়, মা-র কথায় গুনগুন করে যেসব সুর তুলছিলেন খাঁ সাহেব সে তো আর কলমে লিখে বোঝাতে পারব না, তাই সে- চেষ্টাও করছি না। ওটা আমারই থাক। রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর ভাষায় রকমটা ধরাতে গেলেও ওঁদের বইগুলো সম্পূর্ণ উদ্ধৃতকরতে হয়। তারও দরকার নেই, বইগুলোই যখন আছে। আমি বরং ওদেঁর আরেকটু বর্ণনা করি, বিশেষ কয়েকটা ব্যাপারে ওঁদের ভাবনার ধরনটার কথা বলি।

।। তিন ।।

রাগ - অনুরাগের কাজ হচ্ছে যখন লন্ডনে, তখন কলকাতায় উদয়শঙ্কর দেহরক্ষা করলেন। রবিশঙ্কর এক অপূর্ব স্মৃতিচারণা লিখে পাঠান আনন্দবাজারে। সেখানে দাদার অজস্র গুণ এবং ক্যারিশমা বোঝাতে গিয়ে ওঁর সেক্স অ্যাপিলের কথা বলেন। তাতে অনেকবাঙালিই রে রে করে উঠেছিলেন। এসব কী বলছেন রবিশঙ্কর, যাঁকে কিনা আমরা দেবতার আসনে বসাই। পরে রাগ - অনুরাগ ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সময়ও অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন ওঁর জীবনে প্রেমের প্রসঙ্গগুলো নিয়ে। তখন আমারই বড় অস্বস্তি হচ্ছিল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এসব কথা বার করার জন্য। ভাবলাম, শেষে আমার অত্যুৎসাহের জন্য আজ ভালো মানুষটার এই হ্যাপা।

অথচ রাগ - অনুরাগ বই আকারে বেনোর সময় রবিশঙ্কর সব দোষ আর নিন্দেই নিজের ওপরে নিলেন। লিখলেন, 'তবে হ্যাঁ, যখন সাত - পাঁচ ভাবি, যখন ভাবি এই লেখার মধ্যে আমি কতখানি নিজের দোষ স্বীকার করে উঠতে পেরেছি, তখন আর আমারআপশোস থাকে না। হাজার হোক আমি তো দেবতা নই। যাঁরা আমাকে দেবতা জ্ঞান করতেন তাঁরা যদি আজ আমাকে রক্ত - মাংসের মানুষ জেনেও ভালোবাসেন তবেই না আমার জীবন সার্থক। উঁচু পিঁড়িতে বসে শ্রদ্ধা পাবার অভিলাষ আমার নেই। যেটুকু গান - বাজনা করেছি, মানুষকে যেটুকু আনন্দ আজ অবধি দিয়েছি, তার বিনিময়ে যেটুকু

শ্রদ্ধা - ভালোবাসা মানুষ আমায় দিতে পারেন তা পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। কারণ জানব, ওইটুকুই আমার সত্যিকারের পাওনা।'

যে - কথাটা নিয়ে খুব হইচই হতো সেটা রবিশঙ্করের এক অত্যন্ত সরল, আন্তরিক কথা। বলেছিলেন, আমি একই সঙ্গে অনেক মেয়েকেই সমান ভালোবাসতে পারি। কাউকে বেশি ভালোবাসার জন্য কাউকে কম ভালোবাসতে হয় না। তা এর মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায় তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না। রবিশঙ্করকে দীর্ঘদিন খুব কাছ থেকে দেখেছি বলে জানি এর মধ্যে কোনো ভান বা ভেজাল নেই। মানুষটা সত্যিই এরকম । যখন এসব কথা বলছেন তখন ওঁর সঙ্গে বিবাহিত না হয়েও স্ত্রীর মতনই থাকেন গায়িকা লক্ষীশঙ্করের বোন কমলা চত্রবর্তী। আর সে - সময়ে নিউ ইয়র্কে তাঁর আরেক সংসার মার্কিন মহিলা স্যু জোনসের সঙ্গে। পরে যাঁর গর্ভে ওঁর এক কন্যা হয় -- নোরা জোনস, যে - নোরাকে আজ সারা পৃথিবী এক ডাকে চেনে। উপরন্তু দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রথমা স্ত্রী অন্নপূর্ণা শঙ্করের সঙ্গেও তখন শিল্পীর লিখিতভাবে বিব াহ - বিচ্ছেদ হয়নি। বইয়ের জন্য অন্নপূর্ণা বা কমলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিংবা একান্তে আমাকে স্যু জোনসের স ম্পর্কে বলতে গিয়ে রবিশঙ্করকে এতটাই আপ্লুত ও অনুভূতিপ্রবণ লাগত যে, এই তিনজন ও ওঁর অন্যান্য অনুরাগিনীদের কারণে, যোগাযোগে ও দূরত্বে ওঁর ভেতরে যে কী অন্তঃশীল আনন্দবিরহ কাজ করে সারাক্ষণ, তা আঁচ করতে পারতাম। কে জানে, প্রেম - ভালোবাসা নিয়ে হয়তো আরো বলার চেষ্টা ছিল লোকটার, বাঙালি পাঠকের কথা ভেবেই অনেক কিছু না - বলা রেখে দিলেন! উনি হয়তো বলবেন, না - বলা কথার জন্য তো আমার সেতারই আছে! অনুমানটা এজন্যই করলাম কারণ বছরকয়েকআগে ওঁর ইংরেজিতে যে - আত্মজীবনী বেরিয়েছে তাতে প্রেম - ভালোবাসার কথা আরোই ক্ষীণ, যদিও ভাষাটা ইংরেজি। আর ভয়ও হয় -- তাহলে কি রবিশঙ্কর বয়স, সময়, পরিস্থিতির চাপে নিজেকে কিছুটা হলেও দেবতার আসনে বসাচ্ছেন! নাকি সর্বক্ষণ খোঁচানোর জন্য এক তণ, বেপরোয়া, শঙ্করলাল এই বইয়ের কাজে নেই।

কম খোঁচাতে হয়নি আমাকে বিলায়েৎ খাঁ সাহেবকেও। প্রেমের কথা উঠলেই যিনি ওঁর সেতারটা দেখাতেন। ওঁর প্রথম ও শেষ প্রেম হিসেবে তুলে ধরতেন সেতারকে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী মনীষা হাজরার সঙ্গে ওঁর পরিচয়, ভ ালোবাসা, বিয়ে ও বিচ্ছেদের কথা বললেন। বললেন ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী লিজার কথা। আর তারপরেই ঘুরেফিরে সেতার। ফের নতুন করে প্রেমের কথা উঠলে বলতেন, প্রেম তো হয়েইছে। কারও চেয়ে কিছু বেশিও কিছু কম না। এই 'কারও চেয়ে' কথাটা যে কাকে মনে করে বলতেন, তাও আমি দিব্যি টের পেতাম। রাগ - অনুরাগে রবিশঙ্করের প্রেমের কথাবার্তা নিয়ে আলোড়নের কথা তো ওঁর অজ্ঞাত ছিল না! সারাটা জীবন দুই শিল্পী সেভাবেই একে বাড়িয়ে বলার সামান্য সুযোগও নেই। অন্যজন কোন আসরে কী বাজিয়ে মাত করল, কার সঙ্গে বেশি ওঠাবসা, কী রাস্তায় ভাবছে, কোন রাস্তায় চলছে, অপরজনের তা প্রায় নিটোল মুখস্ত। বিতর্ক ও বিবাদের পর সার্ত্র এবং কামুর সম্পর্কের মতন। তাতে একটা ধারণাও জন্মেছিল আমার যে, বিলায়েৎ সম্পর্কে বই লেখার পক্ষে রবিশঙ্কর, এবং রবিশঙ্কর সম্পর্কে বই লেখার পক্ষে বিল ায়েতের চেয়ে ভালো লোক হয় না। আবার যদি কখনো রবিশঙ্করের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলার সুযোগ হয় , তো ইচ্ছে অ াছে শুধু বিলায়েৎ আর আলি আকবর খাঁ নিয়ে কথা বলব। যদিও জানি না, তেমন সুযোগ আর হবে কিনা। আর তখন জিজ্ঞেস করব বিলায়েৎ খাঁ ও নার্গিসের প্রেমের কথা কি তিনি জানতেন? সংগীতমহলের পুরনো জমানার কেউ কেউ জ ানতেন, রবিশঙ্কর জানবেননাএমনটা মনে হয় না, কিন্তু কখনো আমায় কিছু বলেননি।

বারবার প্রেমের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে শেষে আমি ওসব কথা তোলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন গভীর সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে যেদিকে গঙ্গা বইছে সেই অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে (মনে হয় আমার থেকে চোখের জল আড়াল করারজন্যই) নার্গিসের প্রসঙ্গ পাড়লেন। যেহেতু নাম না করেই -- একজন হিরোইন, একজন দাণ সুন্দরী বম্বে হিরোইন, এইরকম করে করে -- পুরো ঘটনাটা বলে গেলেন। বললেন, আমি ভালো গাইতামও, তবু শুধু মার কথায় গান ছেড়ে দিলাম, কারণ মা বললেন, আমি গানের বাড়ির মেয়ে। তবু তোমাকে গান ছেড়ে শুধু সেতার নিয়ে থাকতে বলছি ক ারণ ওটা তোমার বাপ - ঠাকুরদাদা আর আমার স্বামীরবাড়ির শিল্প। যে - রাতে মা একথা বললেন তারপর থেকে পড়ে রয়েছি শুধু সেতার নিয়ে।

এই মা -ই ফের বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। শেষে যেদিন হেস্তনেস্ত হলো বিলায়েৎ জ

ানলেন যে, যে - মেয়ের জন্য তিনি দিওয়ানা সে আসলে তাঁরই পিতার সন্তান বিখ্যাত গায়িকা জদ্দন বাইয়ের গর্ভে! আমি আকাশ থেকে জমিতে পড়েছি খাঁ সাহেবের কথা শুনে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কথা কি টেপে রাখব? উনি শান্ত গলায় বললেন, তুমিজানতে চাইলে না? তাই তো লেখার জন্যে বলছি। করো, রেকর্ড করো। তবে মেয়েটির নামটা এখন লিখবে না। আমি যখন থাকব না তখন দুনিয়াকে বোলো।

কে জানত তখন এর বছর দেড়েকের মধ্যে উনি চলে যাবেন? আর সেই নামটা আমি করব ওঁর স্মৃতিবাসরে! পরে বিলায়েৎ- নার্গিস পুরো প্রসঙ্গ নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম 'হায় চাঁদ!' শিরোনামে গল্পটা লিখতে গিয়ে কত - কতবার যে চোখে জল এসেছে শিল্পীর সেই সন্ধ্যার মুখটা মনে পড়ে!

সেদিন রাতে রায়চক থেকে ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল। চলে আসার আগে একটা অদ্ভুত কথা বললেন বিলায়েৎ খাঁ, বেশ আচমকাই। বললেন, তুমি রবিশঙ্করজিকে খুব ভালোবাস, না? আমি বুঝলাম না কথার প্যাঁচটা, হঠাৎ করে এমন প্রশ্নই বা কেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন জিজ্ঞেস করলেন এটা? বিলায়েৎ খাঁ বললেন, এত কাজ করলে ওনার সঙ্গে। ভালো না বাসলে এত কথা কেউ বলে? বললাম, আমি তো আপনাকেও ভালোবাসি। না হলে এত বিরক্ত করতে আসি? উনি চুপ করে হাসলেন একটু, তারপর বললেন,ওইজন্যে তো একটা একটা করে সব বলে দিচ্ছি।

।। চার ।।

রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর এক মস্ত মিল ওঁদের বিলাসিতায়। দুজনেরই মহিলাপ্রীতির কথা দুনিয়া কমবেশি জেনে গেছে; যেটা সেভাবে জানতে পারেনি তা হলো দুজনের সুগন্ধি বিলাস, আড্ডার ঝোঁক, পাঁচতারা লাইফস্টাইলের সঙ্গে একটা সরল জীবনধারাকে মেলানোর আপ্রাণ চেষ্টা। সুগন্ধির ব্যাপারে রবিশঙ্করকে তো অক্সফোর্ডের ডক্টরেটই অর্পন করা যায়। পুষের ওদ্ তোলায়েৎ ও আফটার সেভ, মহিলার ওদ্ কোলোন ও পারফিউম সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান ঝিকোষ গোত্রীয়। তবে দুনিয়ার পর সুগন্ধিপরখ করে শেষ অব্ধি থিতু হয়েছিলনে দুটি সুগন্ধিতে --- এক, ত্রিশ্চন দিয়োরের 'ও সোভাজ' ওদ্ তেয়ালেৎ ও 'আর্ডেন স্যান্ডালউড ফর মেন' । দ্বিতীয়টি ওঁর মনে ধরেছিল, ওতে চন্দনের সুঘ্রাণ ধরা আছে বলে। সেজন্য একটা দুশ্চিন্তাও ভর করেছিল ওঁকে, কারণ আর্ডেনের এই সুগন্ধির নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল চন্দন কাঠ জোগাড়ের অসুবিধের কারণে। আরেকটি কোলোনও প্রিয় ছিল রবিশঙ্করের এবং ওরকম একটা আমায় উপহারও করেছিলেন বারানসীতে -- 'রোজে এ গালে'। আর্ডেনের ওই চন্দনগন্ধ ছাড়া দেখেছি ওঁর পছন্দের সব ফ্রেগ্রান্সই ফরাসি।

বিলায়েৎ খাঁ সেদিক দিয়ে লক্ষ্ণৌয়ি, ওঁর দুর্বলতা মার্গীয় আতরের প্রতি। যদিও ওঁর ড্রেসিং টেব্‌লে বিদেশী সুগন্ধিরও ঢালাওআয়োজন দেখেছি। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন, ওঁর তখনকার প্রিয় ফ্রেগ্রান্সের নাম 'ব্রাই'। এটা কোন দেশের, কী জাতের, কেন - কীবৃত্তান্ত সেসব জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওঁর বাড়িতে সে কথা বলতে বলতে যে - সুগন্ধটার ঘ্রাণ পেতাম মাঝে মধ্যে সেটা দামি জর্দার। সে - সময়ে ওঁর সাধের বারাসাতের বিড়ি খাওয়ারও পাট চুকে গেছে শরীরের কারণে।। নাহলে আগেকার দিনে দেখা করতে গেলে ওইছোট্ট ছোট্ট বিড়ির ঘ্রাণ আসত। এক অদ্ভুত তামাকু গন্ধ ছিল সে - বিড়ির। মোটেই বিড়ির টিপিকাল বিটকেল গন্ধ নয়।

জীবনের শেষদিকে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছিলেন বিলায়েৎ খাঁ। যদিও সারাটা জীবন ওঁর প্রকৃত বিলাসিতা ছিল গাড়িতে। '৫১ সালে ফেস্টিভাল অফ ব্রিটেনে অংশ নিয়ে যা আয় করেছিলেন তাতে একটা ওপেন হুড এমজি কিনে নিয়ে চলে এসেছিলেন। তখন, ওঁর ভাষায়, 'আমার ওড়ার দিন।' স্টাইলের বুশ শার্ট, গলায় স্কার্ফ, চোখে গগলস্, ড্যাশবোর্ডে সিগারেটের টিন আর হাতে ওপেনহুড এমজি-র স্টিয়ারিং --- বিলায়েৎ খাঁ এক নিপাট বোম্বাই কা বাবু। দাণ নাচতে পারতেন বিলিতি নাচ, আর কলকাতার গ্রেট ইস্টার্নের ম্যাকিমজের ডান্স ফ্লোরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল প্রথমা স্ত্রী মনীষা হাজরার সঙ্গে।

আরেকটু বয়স হতে প্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল মার্সেডিজ বেঞ্জ। একের পর এক মার্সেডিজ কিনেছেন বিলায়েৎ খাঁ। শুধু ড্রাইভিংয়ের ওস্তাদি নয়, উস্তাদজি ছিলেন একবারে প্রথম শ্রেণির কার মেকানিকও। আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন, একটা গোটা গাড়িকেপার্ট বাই পার্ট খুলে ফেলে সেটাকে কমপ্লিটলি মেরামত করে ফের মিলিয়ে এক করে দিতে পারি, হ্যাঁ। আমি কত বড় সেতারি, সেটা তোমরা বলবে। কিন্তু আমি কত বড় কার মেকানিক সেটা আমি নিজেই জানি। হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসির কথায় মনে পড়ল, রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ দুজনেরই খুব প্রাণখোলা , দমকা হাসি আছে। রবিশঙ্কর আবার দাণ রসগল্প বলিয়ে। খাওয়া - দাওয়ার পর ডিনার টেব্‌লে বসে জোকস্‌ আদান - প্রদান করা ওঁর জীবনযাত্রার অঙ্গ। বিল ায়েৎ খাঁর বিশেষত্ব নানা ধরনের ঘটনার প্রায় রঙিন ছবির মতো নিটোল বর্ণনা দেওয়া । আর বলতে বলতে একটা প্রাচীন কোনো বন্দিশ বা ঠুমরির সুরগেয়ে শুনিয়ে দেওয়ায়। উর্দু মেশানো হিন্দি া বাংলা কথায় সে এক ফাটাফাটি ব্যাপারে দাঁ ড়িয়ে যায়। দার্জিলিংয়ে নৈশভোজের টেবিলেরবিশঙ্করের প্রায় অভিনয় করে দেখানো পরশুরামের একটা গল্প আর র াতের রায়চকে বিলায়েৎ খাঁর গেয়ে শোনানো নানা মহান উস্তাদের গান স্টাইল জন্ম - জন্মান্তরেও ভুলতে পারব না।
যে - একটা ক্ষেত্রে রবিশঙ্কর সমস্ত ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের মধ্যে প্রায় অনন্য, তা হলো ওঁর আশর্চ্য পাঠাভ্যাসে। বাপ্‌ রে, কীসাংঘাতিক বইক্ষুধা এই বয়সেও। কোনো এয়ারপোর্টে দিয়ে যাত্রা করতে হলে লেটেস্ট টাইম ও নিউজ উইক তো কেনা চাই - ই, এবং উড়তে উড়তে সেসব গলাধঃকরণ ও করা চাই। কেনা চাই লেটেস্ট ফিকশন, নন - ফিকশেন যা চোখে পড়ল বুকস্টলে। আর পড়েই সেটা হস্তান্তর করা চাই কোনো পেয়ারের লোককে। এভাবে কিছু বই আমারও হাতে এসে পড়েছে। ভদ্রলোককে মনের মতো বই উপহারকরলে আাদের শেষ থাকে না। মনে আছে, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্সকে নিয়ে টাইমে এক চমৎকার স্টোরি বেরিয়েছিল ১৯৭৭ সালে হেমন্তে। রাগ - অনুরাগের কাজ হচ্ছিল তখন লন্ডনের চেলসি প াড়ায়, শিল্পীর হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে। হকিন্সের ব্যাপারটা পড়ে দাণ চাঞ্চল্যে রবিশঙ্কর সেদিন সকালটা ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞান নিয়ে কথা চালিয়ে গেলেন, মাঝে কথার মোড় ঘুরল নাদ ব্রহ্ম এবং ওঁ - এর দিকে। যারবিশঙ্করের Perfect teetotaller কখনো - সখনো কোনো সেলিব্রেশনে হয়তো একটু স্যাম্পেন বা কনিয়াকে চুমুক দিয়েছেন।
তবে একটা নেশায় দুজনই মাত হয়ে ছিলেন। বিলায়েতের সেই নেশার নাম রবিশঙ্কর, রবিশঙ্করের নেশা বিলায়েৎ খাঁ। কেউই স্বীকার করেননি, কারোরই অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com